সমরসিংহ

রাজস্থান গ্রন্থমালা—চতুর্থ গ্রন্থ

সমরসিংহ

হেন্‌রী ফোর্ড, শিলাদিত্য, মহারাজ গুহ, বাপ্পাদিত্য প্রভৃতি
শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীগরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্‌-সি.

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন.
কলিকাতা—৯

মে
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১.৫০

সমরসিংহ

—:*:—

এক

এক দিন সন্ধ্যায় চিতোরের রাণা সমরসিংহ রাজবাড়ীর উদ্যানে বসিয়া আছেন। পাশেই রাণী পৃথাদেবী বসিয়া বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। বসন্তকাল—গাছে নানারকম ফুল ফুটিয়াছে। তাহাদের গন্ধে ও সৌন্দর্যে চারদিক ভরিয়া উঠিয়াছে।

অথচ সমরসিংহকে দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন এই আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। কি এক চিন্তায় যেন তিনি আনমনা হইয়া আছেন। অথচ এই সময়ে চিন্তিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ।

মেবারের শস্য-ক্ষেত্রে সোনা ফলিতেছে, মেবারবাসীর গৃহে অভাব নাই। প্রজাবৎসল রাণার সুশাসনে প্রজাগণ নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত।

তবু একটি চিন্তা কয়েকদিন যাবৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার ন্যায় সমরসিংহকে পীড়া দিতেছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, কনোজেশ্বর জয়চন্দ্র মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সর্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

সমরসিংহ মনে-প্রাণে রাজপুত। রাজস্থানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, বাপ্পা ও খোমানরাজের সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা তাঁহার জীবনের

স্বপ্ন। তাঁহার বহুদিনের অভিলাষ ছিল, দিল্লী, কনোজ ও চিতোরের সম্মিলিত শক্তিতে হিন্দুস্থানকে এক শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যে পরিণত করা, হিন্দুস্থান হইতে বিদেশী শত্রুকে নির্মূল করিয়া দেওয়া।

তাঁহার এ সাধ তিনি অন্তরের নিভৃত কোণেই পোষণ করিতেছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সময় বুঝিয়া সুযোগ মত তিনি দিল্লী ও কনোজের অধিপতির নিকট তাঁহার এ অভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু বিধাতার অভিশাপে তাঁহার সে সঙ্কল্প আর পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন না।

বাপ্পার রাজত্বের পর সমরসিংহের পূর্ব পর্যন্ত চারি শতাব্দীর মধ্যে আঠারোজন নরপতি সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্তি-গরিমা কালের প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু মহারাজ খোমানের বীরত্ব-গাথাই আজ পর্যন্ত মেবারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

তাঁহার রাজত্বকালে তিনি চব্বিশবার শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারই শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া চিতোরের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই বোগ্‌দাদের খলিফা হারুণ্‌-অল্‌-রসীদের পুত্র আল্‌ মামুনকে চিতোর-দুর্গে বহুদিন পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজকালও উদয়পুরবাসী কাহাকেও আশীর্বাদ করিতে হইলে এই শক্তিশালী রাজপুত বীরের নাম স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন, "খোমান্ তোমাকে রক্ষা করুন!"

সন্ধ্যাবেলা মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া বসিয়া মহারাণা সমরসিংহ অতীতের সেই বীরদের বীরত্ব এবং স্বদেশ-প্রেমের কথাই স্মরণ

করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, রাজস্থানেরই পরম দুর্ভাগ্য। নতুবা যেখানে বাপ্পার মত বীরের জন্ম হইয়াছে, খোমানের মত বীর যেখানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্রবংশের বীরদের পদ-রজে যে দেশ ধন্য হইয়াছে, সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া জয়চন্দ্রের এ দুর্বুদ্ধি হইবে কেন?

মহারাজের এই চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া মহারাণী পৃথা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি ভাবিতেছ, মহারাজ?"

রাণীর প্রশ্নে সমরসিংহের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

সে নিঃশ্বাসে চমকিত হইয়া পৃথা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিতোরের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা, কোন বহিঃশত্রু-কর্তৃক চিতোর আক্রমণের সম্ভাবনা কি মহারাজের এই ব্যাকুলতার কারণ?"

রাণীর প্রশ্নে সমরসিংহ সগর্বে উত্তর দিলেন, "না মহিষী! সে ভয় নাই! যতদিন এ বাহুতে তরবারি ধারণের শক্তি থাকিবে, দেবাদিদেব একলিঙ্গের আশীর্বাদে ততদিন সে ভয় করি না!"

বাস্তবিক তখনকার দিনে সমরসিংহের মত এমন বীর পুরুষ রাজস্থানে খুব কমই ছিল। তাঁহার বিশাল দেহ, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ বাহু ও বীরোচিত মূর্তি দেখিলে সকলেই সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিত।

শারীরিক শক্তির ন্যায় তাঁহার মানসিক সৌন্দর্যও ছিল অতুলনীয়। চিতোরেশ্বর হইয়াও তিনি যোগীর ন্যায় সরল জীবন যাপন করিতেন। পরিধানে পীত বসন, মস্তকে পিঙ্গল জটাজাল, গলদেশে পদ্মবীজ-মাল্য, হস্তে ভবানীর খড়্গ!—

সমরসিংহের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

সিংহাসনে বসা অবস্থায় তাঁহার সেই মূর্তি দেখিলে মনে হইত, স্বয়ং মহাদেবই বুঝি কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন! তিনি যেমন বীর ছিলেন, আবার তেমনি ছিলেন ধর্মভীরু। তাই তখনকার কবিগণ তাঁহাকে 'যোগীন্দ্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের নিকটও তিনি ঋষি-আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন—তাই সমরসিংহের অন্য নাম মহর্ষি।

তাঁহার সে বীরমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামী-গর্বে সৌভাগ্যবতী রাণী পৃথা বলিলেন, "মহারাজ, তবে তুমি আজ এমন বিমনা কেন? অন্যদিন প্রকৃতির যে শোভা দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইতে, যে সৌন্দর্য-বর্ণনায় তুমি পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে, আজ তোমার দৃষ্টি যেন সেখান হইতে কোন্ দূরে চলিয়া গিয়াছে!"

সমরসিংহ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ রাণী! সত্যই আমার দৃষ্টি আর এ উদ্যান-পুষ্পে নয়। আমি ভাবিতেছি, রাজপুত-কুলাঙ্গার জয়চন্দ্রের কথা,—যে স্বদেশ ও স্বজাতির শত্রুতা সাধনের জন্য বিদেশী মুসলমানের সহিত হীন ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারে। দূত-মুখে অবগত হইলাম, পৃথ্বীরাজের প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

পৃথা পৃথ্বীরাজের ভগিনী। তাই ভ্রাতার অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল।

সমরসিংহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "পৃথ্বীরাজ বীর। তুর্ক যদি জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণে দিল্লী আক্রমণ করে তবে দিল্লীশ্বরের হাতে যোগ্য শিক্ষাই লাভ করিবে। সেজন্য আমার ভয় নাই। কিন্তু স্বজাতি-বিরোধে রাজস্থান দুর্বল, সেই সুযোগে কতবার মুসলমান ভারত লুণ্ঠন

করিয়া গিয়াছে ! কেহ তাহাদের বাধা দিতে পারে নাই। তাহাতেও কি জয়চন্দ্রের চক্ষু ফুটে নাই ? তাঁহার এ দুর্মতি ভারতকে কোন্ দুর্গতির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে, আমি শুধু তাহাই ভাবিতেছি রাণী !”

দুই

জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র। জয়চন্দ্র জ্যেষ্ঠ, পৃথ্বীরাজ কনিষ্ঠ। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কি সূত্রে এমন প্রবল শত্রুতার ভাব জাগিয়া উঠিল তাহা জানিতে হইলে পূর্বকথা বলিতে হয়।

দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুন্দরীকে তিনি কনোজ-অধিরাজ বিজয়পালের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার গর্ভেই জয়চন্দ্রের জন্ম হয়।

আজমীর-অধিপতি সোমেশ্বরের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা কমলাবতীর বিবাহ হয়। কমলাবতীর গর্ভেই সোমেশ্বরের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রই আর্যবীর পৃথ্বীরাজ।

জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র, উভয়েই মাতামহের সমান স্নেহ-যত্নের অধিকারী। তাহার উপর জয়চন্দ্র জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন, অপুত্রক মাতামহ তাঁহাকেই দিল্লীর সিংহাসন অর্পণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধে বাদ ঘটিল।

শিশুকাল হইতেই জয়চন্দ্র ক্রূরমতি, খলস্বভাব ও দুর্বল-চিত্ত। জন্ম-জন্মান্তরের অর্জিত পুণ্যফলেই যে দেবভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা যে প্রত্যেক ভারতবাসীরই প্রথম কর্তব্য, জয়চন্দ্রের আদৌ সে বোধ ছিল না। পক্ষান্তরে পৃথ্বীরাজ জন্মাবধিই বীরত্বের উপাসক, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ।

বহুদিন হইতেই মুসলমানগণ পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারত আক্রমণ করিতেছিল। তখনও সে ভয় ছিল। তাই অনঙ্গপাল ভাবিলেন, দিল্লীর সিংহাসন এমন একজনের হাতেই থাকা উচিত, প্রয়োজন হইলে যিনি বুকের রক্ত দিয়াও উহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

পৃথ্বীরাজের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর, তখনই অনঙ্গপাল তাঁহার হাতে দিল্লীর সিংহাসনের ভার দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন "পৃথ্বি! স্মরণ রাখিও, এ রাজ্যে একদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুতে এ স্থান একদিন পবিত্র হইয়াছে। তোমার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিতে এ রাজ্যের পবিত্র সিংহাসন যেন বিধর্মীর দ্বারা কলঙ্কিত না হয়।"

অষ্টম বর্ষ বয়স্ক বালকবীর পৃথ্বীরাজ মাতামহের চরণ বন্দনা করিয়া উত্তর দিলেন, "যে গুরুভার আপনি আমার উপর অর্পণ করিলেন, ইষ্টদেবতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহা নিষ্ঠার সহিত বহন করিয়া চলিব। পাণ্ডুপুত্রগণের স্মৃতিপূত পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুলাভে ধন্য, অতীতের সেই ইন্দ্রপ্রস্থের গৌরব আমা হইতে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইবে না।

অনঙ্গপালের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। দৌহিত্রের মস্তকে তিনি তাঁহার স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, "আশীর্বাদ করি বৎস, বীরভূমির বীরপুত্র হও। তোমার বীরত্বে দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল হোক!"

অনঙ্গপাল সন্ন্যাস ধারণ করিয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। অষ্টম বর্ষ বয়স্ক পৃথ্বীরাজ অমাত্যগণের পরামর্শানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 'জয় পৃথ্বীরাজের জয়!' বলিয়া দিল্লীবাসিগণ তাহাদের নূতন রাজাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল।

তিন

দিল্লীর সম্রাট হইতে না পারিয়া জয়চন্দ্রের মন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। হিংসার আগুনে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। মাতামহের অবিচারের দরুণ তাঁহার সমস্ত আক্রোশ আসিয়া পড়িল নির্দোষ পৃথ্বীরাজের উপর।

পৃথ্বীরাজ বীর, তিনি জয়চন্দ্রের এ আস্ফালনে ভয় পাইবেন কেন? তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কনোজেশ্বর জয়চন্দ্র আমার আত্মীয়, বয়সে জ্যেষ্ঠ! তাঁহার কোন অমর্যাদা করা আমার অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তিনি যদি অযথা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে মাতামহের দেওয়া ধন রক্ষার জন্য অনিচ্ছার সহিতও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে।"

পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সম্রাট্! তিনি এখন বড় হইয়াছেন। এক চিতোরের রাণা সমরসিংহ ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষে তখন পৃথ্বীরাজের সমান বীর কেহ ছিল না। সকল রাজাই তখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া সম্মান করিতেন। চারণ-কবিরা দেশে দেশে পৃথ্বীরাজের জয়গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের এ জয়গান জয়চন্দ্রের কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিত! তিনি ভাবিতেন পৃথ্বীরাজ কোন্ গুণে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! বয়সে জয়চন্দ্রের ছোট; রাজ্য চালনা করার জ্ঞানও তাঁহার চাইতে অনেক কম। তথাপি যে সকলে কেন পৃথ্বীরাজের এইরূপ জয়গান করিয়া বেড়ায়, হিংসায় অন্ধ জয়চাঁদ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না।

হিংসায় লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, জয়চন্দ্রেরও তাহাই হইল। তিনি চারণ-কবিদের মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেখানে পৃথ্বীরাজের নামোচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

জয়চন্দ্র ভাবিলেন, কান্যকুব্জ হইতে পৃথ্বীরাজের নাম মুছিয়া গেল। কিন্তু এইখানেই তিনি বিষম ভুল করিলেন। সকলে যখন পৃথ্বীরাজের কথা ভুলিয়া গেলেন, তখনও কনোজের এক নিভৃত কোণে, এক কুমারী-হৃদয়ে পৃথ্বীরাজের বীরমূর্তি উজ্জ্বল হইয়া রহিল।

মাটির নীচের ক্ষুদ্র বীজ যেমন সকলের অলক্ষ্যে অঙ্কুররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অবশেষে ফলপুষ্পে-শোভিত তরুতে পরিণত হয়, পৃথ্বীরাজের বীরত্ব-মুগ্ধ এই কুমারীও আপনার গোপন অন্তরে অন্যের অগোচরে পৃথ্বীরাজের বীরমূর্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। এ কুমারী অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং কনোজেশ্বর জয়চন্দ্রের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় কন্যা সংযুক্তা।

জয়চন্দ্র ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। অবশেষে একদিন যখন ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। সংযুক্তা যাহাতে পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরক্ত না হন সেজন্য তাঁহাকে নানারকম ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের জয়গানকারী চারণ-কবিদের মুখ বন্ধ করিয়াই যে জয়চন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি অহর্নিশ তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। ছলে বলে কৌশলে পৃথ্বীরাজকে অপমানিত করাই তাঁহার জীবনের ধ্যান হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন তাহার সুযোগও মিলিয়া গেল।

জয়চন্দ্র সংবাদ পাইলেন, মুন্দরের পুরীহর রাজার কন্যার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহসম্বন্ধ একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি মুন্দর-রাজকে এ বিবাহ স্থগিত রাখিয়া অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁহার কথায় ভুলিয়া মুন্দর-রাজ সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, অপমানিত পৃথ্বীরাজ এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুন্দর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া জয়চন্দ্র পুরীহর নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সঙ্গে আনহলবারাপত্তনের রাজাকেও টানিয়া লইলেন, ভাবিলেন, এই ফাঁকে পৃথ্বীরাজকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধে পৃথ্বীরাজেরই জয় হইল, জয়চাঁদ মলিন মুখে নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

পরাজয়ের অপমানে জয়চন্দ্র আহত ফণীর মত আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। যাহাতে এ পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, কনোজেশ্বর কেবল সেই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে সুযোগ জুটিয়া গেল।

এই সময় নাগরকোটের এক স্থানে মাটির নীচে প্রায় সাত কোটী স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইল। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ তাহা দাবী করিয়া বসিলেন। ক্রূরমতি জয়চন্দ্র পত্তন-রাজের সহিত মিলিত হইয়া তাতার সৈন্য সহায় করিয়া পৃথ্বীরাজকে এ মুদ্রা গ্রহণে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। এ সংবাদ পাইয়া চিতোরেশ্বর সমরসিংহ শ্যালকের সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

পত্তন-রাজ সমরসিংহের শ্বশুর বলিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া মুসলমান সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের ভার লইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী

দিল্লীশ্বরের গলদেশেই বিজয় মাল্য অর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্রকে আবার মুখ চুন করিয়া কনোজের পথে ফিরিয়া যাইতে হইল। নিহত সৈন্যের রক্তস্রোতে যুদ্ধভূমি কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল।

এতদিন শুধু পৃথ্বীরাজই জয়চন্দ্রের বিষ-নয়নে ছিলেন, এ যুদ্ধের ফলে সমরসিংহের উপরও তিনি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। সমরসিংহের জন্যই যে চিরশত্রু পৃথ্বীরাজকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইল না, একথা কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারিলেন না।

তাই তিনি পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ উভয়কেই অপমান করিবার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

চার

জয়চন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের সব নরপতিই যে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া সম্মান করিতেন, ঈর্ষ্যাকাতর জয়চন্দ্রের তাহা কিছুতেই সহ্য হইত না। পৃথ্বীরাজের এ সম্মান যেন তাঁহার বুকে শেলের মত বিঁধিত।

তাই তিনি কৌশলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কনোজে এক রাজসূয়-যজ্ঞের ব্যবস্থা করিলেন। যে রাজাকে অন্য সকল রাজা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই শুধু রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার অধিকারী। কাজেই রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অর্থই হইল, যজ্ঞকারী রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া।

যজ্ঞশেষে কনোজকুমারী সংযুক্তার স্বয়ংবরা হইবার আয়োজনও করা হইল। সংযুক্তার রূপ-লাবণ্যের কথা রাজস্থানের কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কাজেই রাজসূয়-যজ্ঞ ও সংযুক্তার স্বয়ংবরার নিমন্ত্রণ সকল রাজাই সানন্দে গ্রহণ করিলেন। শুধু দুইজন যজ্ঞের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। একজন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, আর একজন চিতোরেশ্বর সমরসিংহ।

তাঁহাদের এই প্রত্যাখ্যানে জয়চন্দ্রের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহাদের দুইটি মূর্তি নির্মাণ করাইয়া দ্বারপাল বেশে যজ্ঞসভার দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন।

এ সংবাদ দিল্লী ও চিতোরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পৃথ্বীরাজ

ও সমরসিংহ এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দিল্লী ও চিতোরের বাছা বাছা কয়েকশত সৈন্য লইয়া তাঁহারা ছদ্মবেশে কনোজ যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যখন কনোজ আসিয়া পৌছিলেন তখন যজ্ঞ শেষ হইয়া বিরাট স্বয়ংবর-সভা বসিয়াছে। দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজপুত্রের রূপের আভায় সভা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ রাজাদের ত' কথাই নাই, সংযুক্তার রূপের লোভে পক্ককেশ বৃদ্ধ রাজারাও সভায় উপস্থিত হইয়াছেন!

কারুকার্য-খচিত সে সভামণ্ডপেরই বা কি শোভা! রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর-সভা রচনা করা হইয়াছে। ফুল-ফল-পল্লব-শোভিত দারুময় স্তম্ভের উপর স্বর্ণমণ্ডিত চন্দ্রাতপ; স্তম্ভের সহিত সোনার সূতায় বাঁধা স্ফটিকের আধারে সদ্য-ফোটা সুবাসিত কুসুম-স্তবক। স্থানে স্থানে ধূপদানীতে সুরভি চন্দন-ধূপ পুড়িতেছে, কোথাও স্বর্ণ-আধারে রক্ষিত কস্তুরীর গন্ধে দশদিক আমোদিত হইতেছে।

এক কোণে বৈতালিকগণ মাঙ্গলিক গান গাহিতেছেন, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত কণ্ঠে বেদপাঠ করিতেছেন, কোথাও মধুর নিক্কণে বীণা বাজিতেছে। কোথাও যন্ত্রিগণ যন্ত্রালাপ করিতেছে!

সভার মধ্যস্থলে রত্ন-সিংহাসনে মহারাজ জয়চন্দ্র সার্বভৌম সম্রাটের বেশে বসিয়া আছেন। তাঁহার গলায় ফুলের মালা, কপালে যজ্ঞের ফোঁটা, মাথায় সোনার মুকুট ও হাতে রাজদণ্ড। জয়চন্দ্রের দক্ষিণে মৃগচর্মের আসনে প্রশান্তমূর্তি রাজগুরু উপবিষ্ট। জয়চন্দ্রের সিংহাসনের অদূরে সারি-সারি কাঞ্চন-আসনে দেশ-বিদেশের রাজগণ সমাসীন।

অবশেষে শুভক্ষণ সমাগত হইলে রাজ-অন্তঃপুরে শুভ শঙ্খনিনাদ ও নারীকণ্ঠে উলুধ্বনি উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ-শিবিকারোহণে রাজকুমারী সংযুক্তা সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। শিবিকার পার্শ্বে স্বর্ণপাত্র-হস্তে সহচরী। স্বর্ণপাত্রে দধি, দূর্বা, পুষ্পমাল্য, চন্দন প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য।

সংযুক্তা ধীরে ধীরে শিবিকার সুবর্ণ-ঝালর সরাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রূপের আভায় সভামধ্যে যেন বিজলি খেলিয়া গেল! উপস্থিত রাজন্যবর্গ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন!

সংযুক্তা প্রথমে রাজগুরুর পাদবন্দনা করিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! মনোমত পতি লাভ কর।" তারপর সংযুক্তা পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। জয়চন্দ্রও সেই একই আশীর্বাদ করিয়া পরম স্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

পিতার আদেশে সংযুক্তা অবশেষে রাজন্যবর্গের সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্তে সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ভাট একজন রাজার পরিচয় প্রদান করেন, আর সংযুক্তা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য রাজার কাছে উপস্থিত হন। সকলেই মনে করেন, এই বুঝি তাঁহার গলায়ই মালা পড়িল! এইভাবে সভামণ্ডপ অতিক্রম করিয়া সংযুক্তা মণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পৃথ্বীরাজের মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি যাঁহাকে মনে প্রাণে কামনা করেন, তাঁহার মূর্তি দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। সব কিছু ভুলিয়া সেই মূর্তির গলাতেই তিনি মালা পরাইয়া দিলেন।

সমাগত রাজাদের মধ্যে হতাশার কলগুঞ্জন উঠিল, জয়চন্দ্র

উন্মাদের মত সিংহাসন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "সর্বনাশী! এ কি করিলি? যে আমার চিরশত্রু, দ্বারবান্ করিয়া যাহাকে দ্বারদেশে স্থাপন করিয়াছি, অবশেষে তাহারই গলায় মালা দিলি?"

পতির নিন্দায় সংযুক্তা অধীর স্বরে বলিলেন, "বাবা! পৃথ্বীরাজ তোমার শত্রু হইতে পারেন, তবুও তিনি আমার স্বামী!"

অপমানিত ক্রুদ্ধ জয়চন্দ্র উন্মত্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "হতভাগী, এই মুহূর্তে তুই আমার সম্মুখ হ'তে জন্মের মত দূর হইয়া যা! তোর এ কলঙ্কিত মুখ যেন আর কখনো আমাকে দেখিতে না হয়!" এই বলিয়া তিনি তাঁহার তরবারি উঠাইলেন।

সমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই মূর্তির পাশেই লুকাইয়া ছিলেন। মুহূর্তে তিনি সংযুক্তাকে লইয়া ঘোড়ায় উঠিলেন। শিক্ষিত অশ্ব বায়ুবেগে দিল্লীর পথে ছুটিয়া চলিল।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটিয়া যাইতে সকল রাজা একযোগে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের কাছে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না।

জয়চন্দ্রের সমস্ত সৈন্য ধরাশায়ী করিয়া পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সমরসিংহও জয়চন্দ্রের অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়া বিজয়গর্বে চিতোরে ফিরিয়া গেলেন।

পাঁচ

পৃথ্বীরাজের নিকট বারংবার অপমানিত হইয়া জয়চন্দ্র ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রোষে, ক্ষোভে ও অপমানে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া জামাতার সর্বনাশ সাধনের জন্য তিনি অবশেষে শাহাবুদ্দিন ঘোরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিজের জঘন্য প্রতিহিংসা-বৃত্তির বেদীমূলে ভারতের স্বাধীনতা, হিন্দুস্থানের গৌরব বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না।

মুসলমান ধর্মপ্রচারক মহম্মদের জীবিত কালেই তাঁহার শিষ্যগণ ধর্মবিস্তার ও সেই সঙ্গে রাজ্যবিস্তারের দিকে মনোযোগ দেন। ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের জন্য ভারতবর্ষ চিরদিন বিদেশীর নিকট লোভনীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই মহম্মদের মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরবগণ জলপথে ভারতের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহ আক্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু এই আক্রমণের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। অবশেষে খলিফা বালিদের সময় ইরাকের শাসনকর্তা তাঁহার জামাতা মহম্মদ বীন্ কাশিমকে ভারত-বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ভারত আক্রমণ করিলেন হিন্দুগণ খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাঁহার সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু-অধিপতি দাহির, মহম্মদ বীন্ কাশিমের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। সমুদ্র-উপকূল হইতে মূলতান পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশ মুসলমানদের অধিকৃত হয়। কিন্তু এ অভিযানের ফলও স্থায়ী হয় নাই, কাশিমের মৃত্যুর পরই হিন্দুগণ পুনরায় তাঁহাদের

হারানো রাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। এইরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর গত হইলে ভারতবর্ষের দিকে আবার মুসলমানগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আবার তাহারা ভারতে অভিযান আরম্ভ করে। প্রথম আক্রমণকারী ছিল আরব, এইবারে ভারতের রঙ্গমঞ্চে তুর্কগণের আবির্ভাব হয়।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভারত আক্রমণ করিয়া লাহোরের অধিপতি জয়পালকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ার ও তাহার নিকটবর্তী অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করেন। সুবিখ্যাত লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদ ইঁহারই পুত্র। মামুদ ত্রয়োদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন, প্রতিমা ধ্বংস ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করেন। সুবিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ইঁহার আক্রমণেই বিধ্বস্ত হয়।

এই সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হইয়া উঠিতেছিল।

বঙ্গদেশে পাল রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সেন রাজবংশ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। বিহারের কিছু অংশ পালবংশের শাসনাধীন।

বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত।

চৌহান বংশ দিল্লী ও আজমীর শাসন করিতেছে। এই বংশের সন্তান পৃথ্বীরাজ চৌহান প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি রাজপুতদের গর্ব, বিদেশী মুসলিম আক্রমণকারীদের ত্রাস।

কিন্তু উত্তর ভারতের সর্বাধিক পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হইলেন কনৌজের গাহড়বাল বংশের রাজা জয়চাঁদ।

—উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

জয়চাঁদ অধিকাংশ সময়েই বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। রাজপুত সমাজে পৃথ্বীরাজের সম্মান ও জনপ্রিয়তার জন্য জয়চাঁদ মনে মনে পৃথ্বীরাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। অতএব ভারত আক্রমণকারী মুসলমানগণ জয়চাঁদকেই পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিপক্ষরূপে নির্বাচন করিয়াছিল। জয়চাঁদও সহজেই আক্রমণকারীদের ফাঁদে পা দিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতের তৎকালীন রাজপুত বীরগণের কীর্তি প্রসঙ্গে রাজপুত কবি চাঁদ লিখিয়াছেন, পুতনের ভোলা ভীম ছিলেন লৌহদৃঢ় মানুষ। আবু পাহাড়ের জিৎ সিংহ উত্তর আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের মত বিরাজ করিতেন। মেবারের রানা ছিলেন সমরসিংহ। তিনি সবলের নিকট হইতেও কর আদায় করিতেন। দিল্লীশ্বরের শত্রুর পথে সমরসিংহ ছিলেন লৌহ তরঙ্গ। যুদ্ধে তিনি সাহসী, কুশলী এবং স্থিরবুদ্ধি। তিনি ধার্মিক, তিনি মার্জিতমনা। রাজপুত সর্দারগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন, চৌহানদের সামন্তগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যুদ্ধাভিযান কালে অথবা যুদ্ধের সময় যখন বিরতি পাওয়া যায়, তখন সকলে তাঁহার শিবিরেই ভীড় করে। সমরসিংহ যখন নীতিজ্ঞান, রাষ্ট্রদূতগণের কর্তব্যকর্ম, রাষ্ট্র-পরিচালনা, ধর্ম, সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন মনে হয় যেন স্বয়ং খোমান তাঁহার মুখে কথা বলিতেছেন।

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময় গজনী ও হিরাট প্রদেশের মধ্যস্থলে ঘোর নামে একটি পার্বত্য-রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘোররাজ গজনী অধিকার করেন। ইতিহাসে এই রাজবংশই ঘোরীবংশ নামে পরিচিত।

ঘোরীবংশে গিয়াসুদ্দিন ও শাহাবুদ্দিন নামে দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজা হইলেও আধিপত্য কনিষ্ঠের হাতেই ছিল। এই শাহাবুদ্দিনই মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন কুতুবউদ্দিন। তিনি তাঁহার সহায়তায় ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া যখন পুনরায় নূতন ভাবে সৈন্য সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য কুলাঙ্গার জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

মহম্মদ ঘোরী এ সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের শত্রুতার সুযোগে একবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে সমগ্র ভারতেই একদিন তাঁহাদের অর্ধচন্দ্র-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিবেন। মহম্মদ কালবিলম্ব না করিয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ ভারতের দিকে যাত্রা করিলেন।

ক্রূরমতি জয়চন্দ্রের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছয়

যথাসময়ে এ সংবাদ দিল্লীতে পৃথ্বীরাজের কানে গিয়া পৌঁছিল। মহম্মদ ঘোরীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তিনিও আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না। সমগ্র দিল্লী ব্যাপিয়া 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। চৌহান বীরগণের বীরদর্পে দিল্লী নগরী কাঁপিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ বীর-বিক্রমে তরাইন ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরীর সম্মুখীন হইলেন। 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র কম্পিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় বীরগণের বিপুল বিক্রমে মুসলমান সৈন্য দলে দলে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা গোবিন্দের শূলাঘাতে মহম্মদ ঘোরী অচেতন হইয়া রণক্ষেত্রে লুটাইয়া পড়িলেন। ঘোরীর সহকারী কুতুবউদ্দিন তখন অনন্যোপায় হইয়া পৃথ্বীরাজের নিকট হইতে মহম্মদের প্রাণভিক্ষা করিলেন। বীর পৃথ্বীরাজ পরাজিত শত্রুর সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। অচেতন ঘোরীকে লইয়া হতাবশিষ্ট তুর্ক সৈন্য তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। পৃথ্বীরাজের জয়ধ্বনিতে—'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিল্লীর পাষাণপুরী কাঁপিয়া উঠিল।

জয়চন্দ্রের দুরাশা পূর্ণ হইল না। হিন্দুর হাতে লাঞ্ছিত ঘোরীর হিন্দুস্থান জয়ের আশাও সফল হইল না। কিন্তু তাহা না হইলেও লাঞ্ছিত মহম্মদ ঘোরী তাঁহার অপমানের জ্বালা ভুলিতে পারিলেন না

পৃথ্বীরাজ তুর্কদিগকে পরাজিত করিয়া যখন নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটাইতেছিলেন, তখন মহম্মদ ঘোরী আবার নূতন উদ্যমে ভারত

আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্রের অবিরাম প্ররোচনায় দিল্লা-বিজয়ের আশা তাঁহার হৃদয়ে আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজের বহু বীর সামন্ত তরাইনের যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন, যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের সকলের ক্ষত তখনও সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় নাই, এমন সময় ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পুনরায় ভারতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ দূত-মুখে এই তুর্ক অভিযানের সংবাদ চিতোরে সমর-সিংহের নিকটও প্রেরণ করিলেন। শুধু ভগ্নীপতি ও সুহৃদ্ বলিয়া নহে, ধীর-মস্তিষ্ক, অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল ও সুদক্ষ সমরপরিচালনার জন্য পৃথ্বীরাজ সমরসিংহকে সব সময়েই সমাদর করিতেন। তাই হিন্দুস্থানের এই চরম দুঃসময়ে তিনি প্রিয় সুহৃদকে সংবাদ পাঠাইতে ভুলিলেন না।

দূত-মুখে এ সংবাদ অবগত হইয়াই সমরসিংহ তাঁহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। হিন্দুত্বের গৌরব রক্ষার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণ ও তেরো হাজার রাজপুত সৈন্যসহ দিল্লী যাত্রা করিলেন। মহারাণী পৃথাও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

দিল্লী যাত্রার পূর্বে সমরসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের হস্তে চিতোরের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গেলেন। মহিষী কর্মদেবী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্রের নামে রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

তরাইনের রণক্ষেত্রে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। হিন্দুর "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" এবং মুসলমানের "দীন্ দীন্" শব্দে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। কাগার নদীর নীল জল মৃতের রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের অদ্ভুত রণ-কৌশলের নিকট মুসলমান সৈন্য অচিরেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ ঘোরী অবশেষে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, দুই পক্ষেই এই বৃথা সৈন্যক্ষয় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তবে জ্যেষ্ঠের আদেশে তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি পাইলেই তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। যতদিন সে অনুমতি না আসে, ততদিন যেন উভয় পক্ষেই যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়।

সরল-হৃদয় পৃথ্বীরাজ কপটাচারী ঘোরীর প্রতারণা বুঝিতে পারিলেন না। বুদ্ধিমান্ সমরসিংহও এ প্রতারণার জালে ধরা দিলেন। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। রাজপুত সৈন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রামে মত্ত হইলেন।

সুযোগ বুঝিয়া রজনীর অন্ধকারে মহম্মদ ঘোরী অতর্কিতে হিন্দু সৈন্য আক্রমণ করিলেন। নিদ্রিত সেনাদলের নিদ্রার ঘোর না কাটিতেই ঘোরীর সৈন্যদের অস্ত্রের আঘাতে তাহারা জর্জরিত হইয়া উঠিল।

হতবুদ্ধি রাজপুতগণ স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মান-রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেবার-গৌরব সমরসিংহ বিপুল বিক্রমে মুসলমান সৈন্যগণকে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিন দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর সংগ্রামের পর বীরকেশরী সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজও শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। "আল্লাহো আকবর" রবে রণভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিল।

সমরসিংহের শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সাধ আর পূর্ণ হইল না ; পৃথ্বীরাজের পতনের সহিত হিন্দুর গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল! দিল্লীর সৌধশীর্ষে তুর্কের অর্ধচন্দ্র-পতাকা শোভা পাইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের নিধন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পতিপ্রাণা সংযুক্তা ও পৃথা অনলে আত্মবিসর্জন দিলেন। হিন্দুর ভাগ্যাকাশ চিরদিনের জন্য ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল !

সাত

চিতোরে বসিয়া সমরসিংহের প্রধানা মহিষী কর্মদেবী যুদ্ধের এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কিন্তু শিশু কর্ণের মুখ চাহিয়া, চিতোরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি সকল শোকই সংবরণ করিয়া লইলেন। তিনি এক হাতে চোখের জল মুছিয়া আর এক হাতে চিতোরের শিশু-রাজাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

শিশুপুত্রের অভিভাবিকা-স্বরূপ তিনি রাজ্য চালনা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বদাই ভয় ছিল মুসলমানগণ কখন আসিয়া চিতোরের দ্বারে হানা দেয়।

অবশেষে একদিন সে আশঙ্কা সত্য হইয়া উঠিল। তরাইনের যুদ্ধে সমরসিংহের বীরত্বে মুসলমান পক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কুতবউদ্দিন তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অগণিত সৈন্য-সামন্ত লইয়া একদিন অতর্কিতে আসিয়া চিতোরে উপস্থিত হইলেন।

বীরেন্দ্রকেশরী সমরসিংহ যাহাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন, সেই তুর্ক আসিয়াছে! ভয়ে সমস্ত চিতোরবাসীর মুখ শুকাইয়া গেল! সকলেই ভাবিল, এবার আর রক্ষা নাই!

কিন্তু সে বিপদেও একজন অবিচলিত রহিলেন, তিনি কর্মদেবী। চিতোরের সমস্ত সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, "মেবারের পুত্রগণ! আজ সমরসিংহ নাই, কিন্তু তাঁহার সাধের চিতোরের সম্মান রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

মেবারের বীরপুত্র তোমরা, তোমরা কি জননীর সম্মান রক্ষা করিবে না ? যে মেবারের অধীশ্বর মহারাজ খোমান্ চতুর্বিংশবার মুসলমানকে পরাজিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মেবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মেবারের ফলজলে পুষ্ট হইয়া আজ তোমরা মেবারের স্বাধীনতা মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিবে ? মহারাজ সমর্ষির শেষ নিঃশ্বাস আজও বাতাসে সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই, ইহার মধ্যেই কি তোমরা এতখানি কাপুরুষ হইয়া গিয়াছ ? তোমরা কি এক-লিঙ্গের সেবক নও ? সেই রুদ্রশক্তি কি তোমাদের অন্তর হইতে একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে ? মুসলমানের হাতে চিতোর সমর্পণ করিয়া তোমরা কি তাহাদের ক্রীতদাসরূপে ঘৃণিত জীবনযাপন করিবে ? শেষে কি নিজের দেশে পরাধীন হইয়া থাকিবে ?

বলিতে বলিতে কর্মদেবী উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, আর তাঁহার সে তেজোদ্দীপ্ত বাণী শুনিতে শুনিতে মেবারের সামন্তগণের প্রাণে পুনরায় উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, “আমরা প্রাণ দিব, তবুও চিতোর ছাড়িয়া দিব না।”

কর্মদেবী দেখিলেন, চিতোর-বীরদের হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাত সাগরের জলেও সে আগুন নিভিবার নয়। হয় চিতোরের স্বাধীনতা, নয় জীবন দান!—এই তাঁহাদের সঙ্কল্প। কর্মদেবী নিজে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সকলের আগে আগে চলিলেন। সে রণরঙ্গিণী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! মনে হইল স্বয়ং চামুণ্ডা বুঝি দানবদলনে মর্ত্যভূমি অবতীর্ণা হইয়াছেন! তাঁহার উন্মুক্ত কৃপাণের দীপ্তিতে কুতবউদ্দিনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

—বলিতে বলিতে কর্ম্মদেবী উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন —

মরণ পণ করিয়া যাহারা যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, সেই মৃত্যুজয়ী মেবার-বীরদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুজিতে পারে, রাজ্য লোভী কুতবের সৈন্যদের মধ্যে তেমন বীর একটিও ছিল না। তাই তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

কর্মদেবীর ধারাল তরবারির কঠোর আঘাতে আহত কুতব বুঝিলেন, চিতোরের ফণীর মাথায় কেবল মণিই থাকে না, তাহার দাঁতে তীব্র বিষও থাকে! তিনিও চিতোর জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর পথে পলায়ন করিলেন।

কর্মদেবীর বীরত্বে চিতোরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। মেবারবাসী আবার প্রাণ ভরিয়া গাহিল, "জয় চিতোরের জয়! জয় মহারাণী কর্মদেবীর জয়!"

মেঘমুক্ত মেবারসূর্য আবার পূর্ব-গৌরবে জ্বলিয়া উঠিল।

রাজস্থান গ্রন্থমালার পরবর্তী কাহিনী লক্ষ্মণ সিংহ

—ঃ রাজস্থান গ্রন্থমালা ঃ—

পঞ্চম গ্রন্থ

লক্ষ্মণ সিং